DATA ENTERED

নূতনতর গল্প

সুখলতা রাও

DIBRU COLLEGE CENTRAL LIBRARY
ESTD 1963
DIBRUGARH

G1082

G1082

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সূচীপত্র

ভাল পরী ও মন্দ পরী	৭
কিষ্কিন্ধ্যার রাজা	১১
পাহাড়	১৮
হিমানী	২৩
দৈত্যর ছেলে	৩১
তুফান	৪১
গন্ধমাদন পর্বত	৫১
মন্দ পরী	৫৭
রাজার দূত	৬২

নূতনতর গল্প

ভাল পরী ও মন্দ পরী

রাণুর তুই কানে বাসা বেঁধেছে, তুটো পাখি নয়, তু'জন পরী। ভাল পরী যে, সে আগে থেকেই সেখানে ছিল। রাণুকে যা করতে বলত সে, রাণু তাই করত। সেজন্য, লক্ষ্মী মেয়ে ব'লে রাণুকে সকলে ভাল বাসত।

ভাল পরী ও মন্দ পরী

কিছুদিন পরে, মন্দ পরী যাওয়া-আসা করতে লাগল রাণুর কানে। প্রথম প্রথম বিশেষ কিছু বলত না সে, কেবল মাঝে মাঝে ফোড়ন দিত। রাণু হয়ত পুতুল নিয়ে খেলছে, মা ডাকছেন তাকে, শুনে যেতে।

ভাল পরী বল্‌ল, "যাও রাণু, মা ডাকছেন; আগে শুনে এস, পরে পুতুল খেলো।"

অমনি মন্দ পরী বলে উঠল, "কি মুস্কিল!"

বন্ধুরা এসেছিল বিকাল বেলা, খেলতে। তাদের সঙ্গে হুটোপাটি ক'রে, সন্ধ্যা বেলা রাণুর কুঁড়েমি লাগল, পড়তে বসল না। ভাল পরী যতই বলছে, "পড়া করবে না রাণু? কাল যে ইস্কুল আছে।" ততই মন্দ পরী বলছে, "এক বেলা না পড়লে কি হয়েছে? সকাল সকাল উঠে পড়ে নিলেই হবে।"

কিন্তু সকাল বেলা তার উঠতে দেরি হল। কোনও রকমে বইএর পাতায় চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর তাড়াতাড়ি স্নান সেরে, খেতে খেতে, এসে পড়ল স্কুলের গাড়ি। ক্লাসে পড়া পারল না রাণু।

এদিকে, মন্দ পরী ক্রমেই গলা চড়াচ্ছে। শেষটায় এমন জোরে কথা বলতে আরম্ভ করেছে যে, ভাল পরীর নরম গলা প্রায় শোনাই যায় না। রোজই রাণুর পড়া হয়ে ওঠে না রাত্রে, রোজই সকালে তাড়াহুড়ো লেগে যায়।

সেদিন স্কুলের গাড়ি এসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি যেমন রাণু বইপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে, হাত থেকে পেন্‌সিলটা পড়ে গেল মাটিতে; পেন্‌সিলের মুখ গেল ভেঙ্গে। পেনসিল কাটবার সময় নেই। সে বাবার টেবিল থেকে খপ্ করে তাঁর পেন্‌সিল তুলে নিল। তিনি মাঝে মাঝে অমন তাকে দিয়ে থাকেন নিতে। কিন্তু নেবার সময়ে হাত লেগে গেল দোয়াতে; উল্টে গেল দোয়াতটা।

বিকালে স্কুল থেকে ফিরে, ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রাণু শুনতে পাচ্ছে বাবা ধমকাচ্ছেন চাকরকে, "একটু সাবধান হয়ে ঝাড়পোঁছ কর না কেন? দেখ তো কি কাণ্ড করেছ আমার টেবিলে! কালি পড়ে কাগজপত্র সব নষ্ট হয়ে গেছে।"

ভাল পরী রাণুকে বল্‌ল, "তুমি সকালে কালি ফেলেছিলে; ও বেচারা মাঝখান থেকে বকুনি খাচ্ছে। বলে এস বাবাকে যে, তুমি ফেলেছ, ওর দোষ নেই।"

অমনি মন্দ পরী চীৎকার করে উঠল, "কিছু দরকার নেই বলবার। বললেই বকুনি খাবে। তার চেয়ে, চুপ করে থাক। চাকরের বকুনি খাওয়া তো হয়েই গেছে।"

ছোট্ট খুকি বোন যত বড় হচ্ছে, তত বেশী বেশী ভালবাসছে তাকে তার ছোট রাণুদিদি। তার সঙ্গে খেলা করে রাণু, মা যদি কাজে ব্যস্ত থাকেন; তার দেখাশোনা করে। এক ছুটির দিনে, মা বললেন, "রাণু, আজ ঠাকুর আসে নি, আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি। বোন ঘুমাচ্ছে, তুমি একটু নজর রাখ। এ ঘর ছেড়ে কোথাও যেও না, যতক্ষণ না আমি আসি।"

মা চলে গেছেন; রাণু ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে, আয়নার টেবিলের কাছে এটা ওটা নাড়া-চাড়া করছে। বোন ঘুমাচ্ছে।

খানিক পরে, ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ শব্দে ডুগডুগির আওয়াজ এল। মন্দ পরী বলে উঠল, "ঐ বাঁদর-নাচওলা এসেছে পাশের বাড়িতে। দেখবে না? বারান্দায় চল না? কতক্ষণই বা লাগবে। বোন তো ঘুমাচ্ছে।"

ভাল পরী নিচু গলায় আরম্ভ করেছে, "মা যে মানা করেছেন—"

G1082

কিন্তু ততক্ষণে রাণু বারান্দায়। পাশের বাড়ির ছেলে-মেয়েরাও তাদের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়েছে।

উঠোনে বাঁদর-নাচওলা ডুগডুগি বাজিয়ে, সুর করে বলছে, "বাঁদরী শ্বশুর বাড়ি যাবে-এ—।" বাঁদরীটা লাল ঘাগরা পরে, লাল ওড়নার ঘোমটা টেনে, ঘুরে ফিরে নাচছে। সবাই মহাখুশি,—হাসছে, হাততালি দিচ্ছে। রাণুও হাসছে। খুব মজা লাগছে তার। খুকুর কথা ভুলেই গেছে সে। হঠাৎ, হুম্ করে একটা শব্দ হল, আর খুকু চীৎকার করে কেঁদে উঠল। ছুটে ঘরে গিয়ে রাণু দ্যাখে, খাট থেকে পড়ে গেছে খুকু; তার কপাল কেটে রক্ত ঝরছে।

খুকুর কপাল কিছু দিনেই সেরে গেল। কিন্তু, সেই যে সেদিন রাণু কান থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল মন্দ পরীকে, আর কখনও তাকে কাছে আসতে দিল না।

কিষ্কিন্ধ্যার রাজা

বানরদের দেশ কিষ্কিন্ধ্যা; বন-জঙ্গলে ভরা। দলে দলে বানর থাকে সেখানে। এক এক দলের এক এক সর্দার,—পালের গোদা। বানরদের ভিন্ন ভিন্ন দলের ভিতরে ঝগড়া-ঝাঁটি মারামারি যে হয় না তা নয়। তবে বন্ধুতাও আছে পরস্পরে। বনের জন্তু, বাঘ ভালুক বেরোলে, যে দেখতে

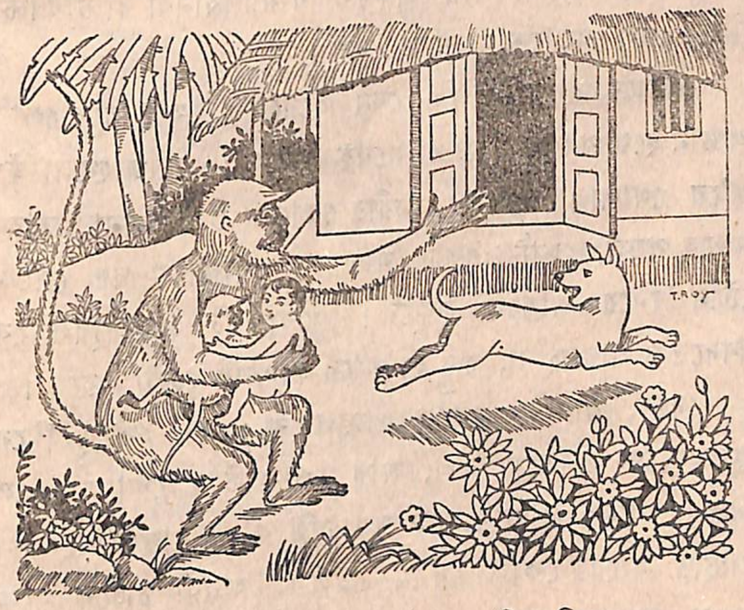

বানরী দৌড়ে গিয়ে কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিল

পায় সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে সাবধান করে দেয়। দেশের ভাল সবাই চায়।

কিষ্কিন্ধ্যা থেকে দূরে মানুষদের দেশ। বানর বানরীরা দল বেঁধে যায় সেখানে বেড়াতে। কি সুন্দর ঘরবাড়ি করেছে

১৪০। ৫

মানুষরা। কত রকম জিনিস দিয়ে সাজিয়েছে সেই সব বাড়ি। সুবিধা পেলেই, বানরেরা চুপিচুপি ঘরে ঢুকে, চারিদিক ঘুরে ছাখে। আয়নাতে নিজের ছায়া পড়ে, বানর ভাবে, বুঝি অন্য একটা বানর ওখানে, তাই সে তাকে দাঁত খিঁচোয়; সেও দাঁত খিঁচোয় দেখে আরো রেগে যায়। খাবার হাতের কাছে পেলে, খেয়ে নেয়। মানুষদের সঙ্গে ভাব হয় না তাদের।

এই রকম, একবার একদল বানর বানরী বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে, গেল বেড়াতে মানুষের দেশ।

সেবারে সেখানে কি যেন হয়েছে। ঘরে ঘরে লোক অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে, কেউ বা মরেই গেছে। দরজাগুলো হাঁ ক'রে খোলা। একটা বানরীর কোলে ছোট্ট ছানা, তার নজরে পড়ল, ছোট্ট একটি মানুষের খোকাকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে আসছে কুকুরে। খোকাটি এত দুর্বল যে কাঁদতেও পারছে না, শুধু হাঁ ক'রে কাঁদবার চেষ্টা করছে।

দেখে, বানরী থাকতে পারল না; সে দৌড়ে গিয়ে কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিল, আর খোকাটিকে কোলে তুলে নিল। বানর বাচ্চার সঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে মানুষের খোকা বাচ্চার মায়ের কোল ঘেঁষে রইল। বানরী দুটিকে বুকে চেপে, লাফাতে লাফাতে রওনা হল নিজের দেশে।

দু'দিনের পথ কিষ্কিন্ধ্যা। মানুষের খোকাটিকে পেয়ে, সেখানকার সব বানরীর কি আনন্দ। তারা পালা ক'রে ক'রে তাকে কোলে নিচ্ছে। আদর করছে। গোদা বানরদের কাছে আসতে দেয় না তারা, পাছে খোকাকে কিছু বলে।

কিন্তু গোদারাও ক্রমে খোকাটিকে ভালবাসতে আরম্ভ করল। একদিন এক সর্দার বল্‌ল, "ওকে কি বলে ডাকব আমরা? ওর একটা নাম দেওয়া যাক।"

বানরীরা বল্‌ল, "কিন্তু আমাদের ছানার মত রূপী হুপী কেলো ধলো, এসব নাম চলবে না।"

এক ঠাকুমা বানরী বুড়ী মাথা নেড়ে নেড়ে বল্‌ল, "ওর নাম দিলাম 'রাজা'। ও আমাদের রাজা, কিষ্কিন্ধ্যার রাজা।"

সর্দাররা তাতে সায় দিল, "ঠিক ঠিক।"

তখন হুপ্ হাপ্ হুকু হুকু শব্দে চেঁচিয়ে, লাফালাফি করল সব বানর বানরী। রাজার নামকরণের উৎসব এ।

ক্রমে রাজা বড় হয়, হামা দেয়। বানর বানরীরা তাকে সব সময়ে ঘিরে থাকে, পাছে বনের জন্তুতে নিয়ে যায়। রাত্রে তাকে কোলে নিয়ে, গাছের উপরে ওঠে। বানর ছানারা তার খেলার সাথী।

রাজার জন্য কাপড়-চোপড় যা কিছু দরকার পড়ে, বানরেরা নিয়ে আসে মানুষের দেশ থেকে। একবার আনল এক দোলা-খাট। গাছের ডালে সেই খাট বেঁধে, তার উপর তালপাতার ছাউনি দিল। তৈরী হল রাজার শোবার ঘর।

ক্রমে বড় হচ্ছে রাজা। এখন সে তরতরিয়ে গাছে চড়ে, ডাল ধরে ঝোলে। জন্তু জানোয়ার এলে, নিজেই পালায় বানরদের কাছে। ক্রমে সে বুঝতে পারে যে সে বানর নয়, —অন্য রকম। তার গায়ে লোম নেই, ল্যাজ নেই। হাত

পা নরম মসৃণ। সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, অনায়াসে সে দুই পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে হাঁটে! বানর কই তা তো পারে না! মাঝে মাঝে তার মন কেমন হয়ে যায়, তার ছোট্ট বুক বিষণ্ণ হয়ে পড়ে, ভাবে, "আমি কেন এমন ?"

সময় গড়িয়ে যায়। রাজা কিষ্কিন্ধ্যায় আসবার পর আট বছর কেটে গেছে। আজকাল বানর বানরীরা বলাবলি করে, কিষ্কিন্ধ্যার রাজার তো রাণীও দরকার ; নইলে রাজা কিসের? মানুষ রাজার জন্য মানুষ রাণী চাই। এই বেলা চাই। আর বড় হলে বুড়োধাড়ী মেয়ে আনতে পারা যাবে না।

সর্দাররা বল্‌ল, "ঠিক ঠিক, এই বেলা রাণী আন।"

অমনি একদল বানর বানরী চল্‌ল মানুষদের দেশ থেকে মানুষ রাণী আনতে।

নাপিতপাড়ায়, চালাঘরে, নাপতানী মা একলা থাকে খুকিকে নিয়ে। তার আর কেউ ছিল না। খুকিকে ঘরে রেখে, তালা লাগিয়ে মা যায় কাজ করতে। খুকি একলা খেলা করে, নয়তো ঘুমোয়। যেমন রোজ যায় মা, সেদিনও তেমনি গিয়েছে।

ঘরের দরজা বন্ধ দেখে এক বানরী উঁকিঝুঁকি মারল, এদিকে ওদিকে কেউ আছে কিনা দেখল। কেউ ছিল না। তখন সে জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে চাইল। মেয়েকে একলা পেল। জানালায় ছিল বাঁশের শিক। বানরী দুটো শিক টেনে ভেঙ্গে ফেলে, ঢুকে পড়ল ঘরে, আর মেয়েকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল।

বাইরে আসতেই কিন্তু পাড়ার লোকেরা, বানরী খুকিকে

নিয়ে যায় দেখে, হাঁ হাঁ করে ছুটে এল আর তাড়া করল বানরীকে। ততক্ষণে মা-ও এসে পড়েছে। সে তো হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটেছে সকলের সঙ্গে সঙ্গে। বানরী কিন্তু কিছুতেই খুকিকে ছাড়ল না। মানুষদের তাড়া খেয়ে, রাণীকে জাপটে ধরে, গাছে গাছে লাফাতে লাফাতে চল্‌ল সে। এধার থেকে ওধার থেকে আরও মেলাই বানর বানরী এসে জুটল। বানরের দলের সঙ্গে মানুষরা পেরে উঠল না, তারা ছুটে ছুটে হয়রান হয়ে, হতাশ হয়ে ছেড়ে দিল খুকির আশা।

কিন্তু মা ছুটেছে বানরদের পিছু পিছু, গাছের নিচে নিচে ; যেদিকে তারা গেছে সেই দিকে। দূরে দেখতে পায় ঐ তারা। এমনি যেতে যেতে, একখানে এসে, অবশ পা'য়ে সে বসে পড়ল মাটিতে। বানরগুলো ফিরে চেয়ে বল্‌ল, "থাক্ ও ওখানে, আমরা পালাই।" বলেই সেগুলো উধাও।

কয়েকটা বানরীর দুঃখ হল। তারা ভাবল, "আহা!" ভেবে, নেমে এল মায়ের কাছে ; বোঝালো তাকে, "তোমার মেয়েকে আমরা রাণী করতে নিয়ে যাচ্ছি। খুব যত্নে থাকবে সে। কেঁদো না।"

মা শুধু চোখের জলে ভাসে আর বলে, "আমার মেয়ে দাও। পায়ে পড়ি তোমাদের। ওকে নিলে আমি মরে যাব।"

"তবে তুমিও চল।" বল্‌ল বানরীরা। তারা মাকে নিয়ে ধীরে ধীরে এগোলো।

নাপতানীর হাতে ছিল তার কাজের ঝুলিটা। কাজ থেকে ফিরবার পথে সে দোকান থেকে মিষ্টি কিনে এনেছিল মেয়ের জন্য ও নিজে খাবে বলে। মেয়ের জন্য মিষ্টি সে নিয়ে চলেছিল।

খুকিকে বানরীরা বসিয়ে দিয়েছে গাছের উপরে দোলা-খাটে। চারদিকে বানর দেখে, 'মা' 'মা' বলে কাঁদছে সে। রাজা তার কাছে বসে অবাক হয়ে দেখছে তাকে। নিজের হাত-পা দেখছে, তার হাত-পা নেড়ে দেখছে। রাজার জটপাকানো ঝাঁকড়া চুল, বড় বড় নখ। খুকি তাতে আরোই ভয় পেয়ে 'মা' 'মা' ক'রে চ্যাঁচাচ্ছে।

সারা দিন কিছু খেল না দেল না খুকি ; কেঁদে কেঁদে শেষটায় ঘুমিয়ে পড়ল। রাজা বসে রইল তার কাছে। তখন মা এসে হাজির। বড় মানুষ রাজা কখনও দেখেনি, এমন অদ্ভুত চেহারা দেখে স'রে পড়ল সে, আর গাছের ডালের আড়ালে থেকে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। ভাবল, "নতুন মানুষটা খুকিকে কিছু করবে না তো?"

মা হাঁচড়ে পাঁচড়ে কোনো রকমে গাছে উঠে, মেয়েকে তুলে নিল কোলে। মেয়ে চোখ চেয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল।

তারপর? তারপর আর কি? ক্রমে ক্রমে সবই ঠিক হয়ে এল। সবেরই সুব্যবস্থা হল ক্রমে।

গাছের নিচে, উঁচু করে মাটির ভিত দিয়ে, বাঁশ পুঁতে, মাটি লেপে, পাতার ছাউনি দিয়ে ঘর তৈরী করল মা। বানররা সকলে দৌড়াদৌড়ি করে জিনিসপত্র এনে দিল।

ভারী কাজগুলো তারাই করল। সেই ঘরে মা থাকল খুকিকে আর রাজাকে নিয়ে!

রাজার আর জংলী চেহারা রইল না। মা তাকে নিয়ে ঝরণার জলে স্নান করাল। মায়ের ঝোলার মধ্যে ছিল আয়না কাঁচি নতুন চিরুনি। তাই দিয়ে সে রাজার চুল ছেঁটে, নখ কেটে তাকে ফিটফাট বানিয়ে দিল। তারপর ছোট আয়না-খানা নিয়ে তার মুখের সামনে ধরতে, চমকে উঠল রাজা। এ কি? এ যে খুকির মতই চেহারা! তারপর খুব খুশি হয়ে, হাততালি দিয়ে নাচন জুড়ে দিল।

শেষে খুকির মায়ের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি খুকি আমি, আমরা কি?"

"আমরা মানুষ।" উত্তর করল মা।

তখন বানরদের দেখিয়ে রাজা জিজ্ঞাসা করল, "আর ওরা?"

"ওরা বানর, আমাদের বন্ধু!"

"বন্ধু, বন্ধু। সবাই বন্ধু। কি মজা!"

সেই রাজা বড় হল। বাইরের শত্রু ঠেকিয়ে, কিষ্কিন্ধ্যায় শান্তিতে রাজত্ব করল। বানরেরা স্বীকার করল, পশুপাখির চেয়ে মানুষ অনেক বড়।

পাহাড়

মস্ত উঁচু পাহাড়। মাটি পাথর গাছগাছড়া ভরা তার শরীর ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। নিচে, তার পায়ের কাছের জমি সমান নয়, উচু-নিচু ঢিপিঢাপা উঠছে পড়ছে। সেই জমিতে আছে গ্রাম। গ্রামের লোকেরা শান্তশিষ্ট, চাষবাস করে, গরু ছাগল চরায়। গরু ছাগল নিয়ে পাহাড়ে ওঠে তারা।

সেখানের আকাশছোঁয়া গাছের গায়ে নতুন রকমের ফুলপাতা ঝোলে মালার মত, জালির মত। সেখানে পাথরের গায়েও নতুন রকম ঘাস। সেই সব তুলে আনে তারা। আর, সঙ্গে নিয়ে আসে এই বিশ্বাস যে, পাহাড়টা জীবন্ত, তার প্রাণ আছে। কেননা, তারা যখন পাহাড়ে বেড়ায়, শুনতে পায়, তার বুকের ভিতরটা গুড় গুড় করছে, যেন আনন্দে। গ্রামের মাতব্বরদের কাছে ছেলে-মেয়েরা শোনে যে, পাহাড়ের প্রাণ আছে।

তাই, এক সকালে যখন ছেলেমেয়েরা বড়দের সঙ্গে পাহাড়ে গেল, তারা দল বেঁধে বসল একটা পাথরের উপরে। পাহাড়ের বুক গরগর করে উঠল। ছেলেমেয়েরা হেসে জিজ্ঞাসা করল, "পাহাড়, তুমি এত খুশি কেন? কিসের তোমার আহ্লাদ, বল না?"

পাহাড় উত্তর করল, "বলব? শুনবে? তবে বলি। আমি কি আজকের? আমি অনেক অনেক কাল থেকে

আছি। সেকালে, তখন আমাদের, মানে পাহাড়দের পাখা ছিল,—হাওয়ার পাখা। আমরা পাখা মেলে ঝড় উঠিয়ে উড়ে উড়ে এদেশ ওদেশ বেড়াতাম, যেখানে খুশি বসতাম। যেখানেই বসতাম, সেখানের গ্রাম নগর ঘর বাড়ি সব চাপা

ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে বসল একটা পাথরের উপরে

প'ড়ে যেত। অত কথা ভাবতাম না আমরা, স্বার্থপরের মত, নিজেদের হাওয়া খাওয়াটাই বুঝতাম। কিন্তু, এতে পশুদের আর মানুষদের অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে দেখে, দেবতারা ঠিক করলেন, পাহাড়দের পাখা কেটে ফেলবেন। তারপর থেকে, যেমনি একটা পাহাড় পাখা মেলে আকাশে উঠত, অমনি তার ডানা দুটো কেটে ফেলতেন দেবতারা। দুম্‌-দাম্‌ শব্দে পড়ে যেতে লাগল তারা পৃথিবীর উপরে।

"পাখা কাটা যাওয়া কি সহজ কথা? সাঙ্ঘাতিক বিপদ

তা,—সুখের জীবন নষ্ট হয়ে যাওয়া, চিরকালের মত অচল হয়ে পড়া। যারা পড়ল, তারা কেউ কেউ মুখ গুঁজরে পড়ে রইল মাটিতে, মনমরা হয়ে। কেউ আবার রেগে আগুন হল। মুখ দিয়ে তাদের আগুনের হল্‌কা ছুটল। রাগ বড় মন্দ জিনিস। তাদের নিজেদের ভিতরটা তো রাগে জ্বলে-পুড়ে গেলই, আশেপাশের সকলকেও জ্বালিয়ে মারল তারা। এখনও তাদের অনেকের রাগ যায়নি, এখনও আগুন ছোটে মুখ দিয়ে। যাক্।

"এই সব কাণ্ড দেখে কতগুলি পাহাড় উড়েই, পাখা কাটা যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি ঝুপ করে পড়ল গিয়ে সমুদ্রের জলে। আমিও ছিলাম সেই দলের একজন। আমাদের অবশ্য পাখা কাটা হতে পারল না। সমুদ্রের নিচে আমি রইলাম কিছুদিন। ক্রমে আমার গায়ের সুন্দর গাছপালা সব পচে গেল। সেখানে গজাল প্যাচপ্যাচে শেওলা; আর বাসা বাঁধল নানা রকম বিদ্‌ঘুটে জীবজন্তু,—তাদের কারও আটটা পা, কারও হাত-পা নেই, শরীরে দুর্গন্ধ। কেউ ছোট্ট, আবার কেউ প্রকাণ্ড বড়। কুমীর হাঙ্গর তো সর্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। হায় রে, কোথায় রইল আকাশের আলো বাতাস, কোথায় রইল পাখির গান, ফুলের সুবাস!

"সমুদ্রের নিচটা হল পাতালের রাজ্য; সাপেরা কিলবিল করছে সেখানে। নাগ-নাগিনীরা আসত আমার গায়ে চরতে। তাদের বিষে জ্বলেপুড়ে যেতাম। কিছুকাল এসব সয়ে রইলাম পাখা কাটা যাবার ভয়ে। কিন্তু শেষে আর পারলাম না, পাখা মেলে উঠে পড়লাম জল থেকে। আর যায় কোথা! দেবতারা ছুটে এলেন, ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্ করে দিলেন আমার দুই পাখা কেটে। আমি পড়ে গেলাম এইখানে।"

"তবে তুমি খুশি কেন?" জিজ্ঞাসা করল ছোটরা।

উত্তর এল, "খুশি হব না? এই যে সূর্যের আলো, আলো করছে সব দিক; এই যে দক্ষিণ হাওয়া গায়ে হাত বুলোচ্ছে; এসব তো ফিরে পেলাম। তা ছাড়া, এখন বেশ বুঝতে পারি, আমরা কত ক্ষতি করছিলাম সকলের, সকলকে চাপা দিয়ে। বড় অন্যায় হচ্ছিল সেটা। সে পাপ থেকে দেবতারা আমাকে মুক্ত করে দিলেন। এখন কারও কিছু অপকার করছি না। আমার উপর বেড়িয়ে গ্রামের লোক আরাম পাচ্ছে, আনন্দ পাচ্ছে।

"আমার রাগ হয়নি, শান্ত আছি, এটাতেও আমি খুব সুখী। যদি আমার মুখ দিয়ে আগুন বেরোত, তোমাদের কি কাছে পেতাম? কি বল?"

ছোটদের মনে হল, পাহাড় যেন একটু হাসল; তারপর পাহাড় আবার বল্ল, "সন্ধ্যা হয় হয়। এখন ভাই তোমরা নেমে যাও গ্রামে। আবার কাল এসো।"

ছেলেমেয়েরা যেতেই চায় না। তারা আবার জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, ঐ যে আমরা দেখতে পাই, আগুনের গোলা ছুটে যাচ্ছে আকাশে, ওগুলো কি?"

"ওঃ, ওগুলো? ছোট পাহাড়েরা হাল্কা কিনা, উড়ে অনেক উপরে আকাশে উঠে গিয়েছিল তারা। দেবতারা প্রথম প্রথম তাদের দু'চারটার পাখা কাটলেন; তারা এসে ধমাস্ করে মাটিতে পড়ল, মাটি কেঁপে উঠল, ভূমিকম্পের

মত। কিন্তু নিচের পাহাড়েরা দলে দলে উড়ছে দেখে দেবতারা তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ; ছোট পাহাড় ছেড়ে, বড় পাহাড়দের দিকে মন দিলেন। সেই ছোটরা আকাশে রয়ে গেল। তারা এখনও ঘুরছে বোঁ বোঁ করে। দেবতারা কবে চলে গেছেন, ছোট পাহাড়দের সে খেয়ালই নেই। ছুটে ছুটে হয়রান হয়ে এক একটা রাগে জ্বলে। তারাই আগুনের গোলার মত আকাশে দেখা দেয়। তারপর, জ্বলুনির চোটে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

"আমি অচল হয়ে পড়ে থেকেও শান্তি পাচ্ছি। আর, তোমরা যে আমার কাছে এসে আনন্দ করছ, এইটাই আমার সেরা সুখ।"

হিমানী

মেঘবর্ণ গিরির দক্ষিণ দিকে রূপনগর। তার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে রূপালী নদী। রূপনগরে রূপোর ছড়াছড়ি। সেখানের লোকেরা রূপোর বাসনে খায়দায়, রূপোর আসনে বসে। মন্দিরের চূড়ো রূপো দিয়ে মোড়া।

সেই রূপনগরে শ্রীপতি বণিকের মস্ত বড় বাড়ি। বাড়িতে থাকেন তিনি আর তাঁর স্ত্রী মেনকা। লোকজন কর্মচারী চারিদিকে গিজগিজ করছে। কিন্তু তাঁদের মনে সুখ নেই, কেননা, তাঁদের ছেলে কি মেয়ে একটিও নেই।

রূপো দিয়ে সুন্দর সুন্দর জিনিস, ফুলদানি ধূপদানি, হার মালা, বাসনকোসন তৈরী করান শ্রীপতি। রূপালী নদীতে বড় বড় নৌকো নিয়ে বিদেশীরা আসে, তারা সেই সব জিনিস আগ্রহভরে কিনে নিয়ে যায়।

শ্রীপতি ঘুমের ভিতরে রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, এক সৌম্যমূর্তি বুড়ো মানুষ এসে তাঁকে বলছেন, "গঙ্গা যমুনা নদী যেখান থেকে নেমে এসেছে, সেই বরফের পাহাড়ে তোমরা গিয়ে, যা চাইছ জানাও।"

সকালে উঠে শ্রীপতি গণকঠাকুরকে ডাকালেন, জিজ্ঞাসা করলেন, "এই স্বপ্নের মানে কি ? কত দূরে সেই বরফের পাহাড়, সেখানে যাব কেমন করে ?"

বণিকের হাত দেখে, কোষ্ঠী দেখে, গণকঠাকুর চিন্তা ক'রে বললেন, "আশ্বিন মাসে দিন ভাল থাকে। সেই

সময়ে আপনি ও আপনার স্ত্রী রওনা হবেন উত্তর পাহাড়ের পথে। যাত্রী অনেক, সঙ্গী পাওয়া যায় তখন। খোঁজ রাখবেন।"

খোঁজাখুঁজি ক'রে, একদল যাত্রীর সঙ্গে জুটে গেলেন তাঁরা। ভয়ানক পথ, পাহাড়ের গায়ে ঘুরে ঘুরে উঠেছে। একদিকে গভীর খাদ; পা হড়কালে রক্ষা নেই। অন্য দিকে উঠে গেছে আকাশছোঁয়া পাহাড়। পথে যেতে কষ্ট যেমন, আনন্দও তেমনি। সেখানের গাছগুলিও যেন পাহাড়ের দেখাদেখি, আকাশের পানে উঠেছে। তাদের গায়ে কত নতুন রকম ফুল পাতা। নতুন রকম জীবজন্তু পশুপাখি। ক্রমে শীত বেশী হল; বরফের রাজ্যে এসে পড়েছেন তাঁরা। অন্য যাত্রীরা এইখানেই রয়ে গেল। ঘুরে ঘুরে নানান মন্দির দেখে, তারা নেমে যাবে।

শ্রীপতি আর মেনকা চলেছেন আরও উপরে, তুষার গিরির গা বেয়ে। কত বরফ ঢাকা গহ্বর, ভিতরটা কালো। মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হড় হড় ক'রে নেমে আসছে উপর থেকে। সেগুলি বাঁচিয়ে চলতে হচ্ছে। পশু পাখি কিছু নেই সেখানে। ক্রমে ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে এল তাঁদের শরীর। তাঁরা বসে পড়লেন একটা পাথরের উপর। তখনি সামনে দেখা দিলেন তুষার দেবী; তুষারে গড়া উজ্জ্বল চেহারা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাও তোমরা? এত কষ্ট ক'রে, এই মহাহিমের দেশে, আমার কাছে এসেছ কি জন্য?"

শ্রীপতি ও মেনকা প্রণাম ক'রে বললেন, "একটি ছেলে

তুষার দেবীর কাছে শ্রীপতি ও মেনকা

কি মেয়ে দিন আমাদের।" তুষার দেবী হাসলেন, বললেন, "এস আমার সঙ্গে।"

পাহাড়ের গায়ে, খানিকটা সমান জায়গা ছিল,—বরফের মাঠ। সেখানে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ে অনেকগুলি খেলে বেড়াচ্ছিল। তারা দেখতে ঠিক বরফের পুতুলের মত। তাদের মধ্যে থেকে, ছোট্ট একটি খুকি গুট্‌গুট্ করে এসে মেনকার মুখের দিকে অবাক হয়ে চাইল। বরফের মত ধপধপে তার গা, চোখ দুটি পাহাড়ের ছায়ার মত গাঢ় নীল, চুলগুলি কালো মেঘের মত। মেনকা টপ ক'রে তুলে নিলেন খুকিকে। বাঃ,—তার শরীর তো বরফের নয়, মানুষের মত সে নরম, গরম!

তুষার দেবী বললেন, "এই তোমাদের মেয়ে। নিয়ে যাও একে।"

খুকিকে নিয়ে নামতে, কষ্ট হবে তার, তাই দুইজন ঝাঁপানওলা যোগাড় ক'রে দিলেন তুষার দেবী। একটাতে উঠলেন শ্রীপতি। অন্যটাতে উঠলেন মেনকা, মেয়েকে নিয়ে। তারপর রওনা হলেন তাঁরা নিচের দিকে।

রূপনগরের লোকে ছুটে এল শ্রীপতির মেয়ে দেখতে। এমন তারা আগে কখনও দেখেনি; ভাবল, "দেবীর মেয়ে কিনা, তাই দেবীর মত দেখতে।"

শ্রীপতি ও মেনকা মেয়ের নাম রাখলেন 'হিমানী'। 'হিমু' বলে ডাকলেন তাকে। হিমু হাসে খেলে মা বাপের সঙ্গে। ক্রমে যত বড় হয়, এদিক ওদিক নজর করে। গাছে গাছে পাখিরা গান গায়, সে কান পেতে শোনে, তাদের মত

সুর বের করে ছোট্ট মুখ থেকে। যখন বাগানে বেড়াতে শিখল, নানা রঙের ফুল দেখে তার কত আনন্দ; এ ফুল শোঁকে, ও ফুল তোলে। ভোমরা প্রজাপতিদের ধরতে যায়।

বেড়াল কুকুর দেখলে কিন্তু ভয় লাগে তার; পালিয়ে যায় মায়ের কাছে। তাই বেড়াল কুকুর, জন্তু জানোয়ার কোনো আসতে দেওয়া হত না ওদের বাড়িতে।

রূপো বাঁধানো মন্দিরের চুড়ো যখন রোদ প'ড়ে ঝলমল করে, অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে থাকে সে; বুঝি মনে প'ড়ে যায় বরফ ঢাকা পাহাড়ের চুড়োকে। কেমন গম্ভীর গম্ভীর স্বভাব হিমুর; কেমন দূর-দূর ভাব। 'কেন?' ভাবেন মা বাবা। শ্রীপতি বলেন মেনকাকে, "তুমি ওকে বড্ড বেশী পুতুপুতু করে রাখছ। একটু খেলুক, দৌড়ুক, হুটোপাটি করুক পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। তবে তো মন বসবে। শরীরও শক্ত হবে।"

পাড়ার ছেলেমেয়েরা খেলতে আসে মাঝে মাঝে। তাদের নিয়ে বাগানে খেলাও করে হিমু, হাসে কথা বলে; কিন্তু তারা বেশী ঘেঁষতে সাহস পায় না, তার চেহারা দেখেই হোক, বা তার দূর-দূর ভাব দেখেই হোক। হিমুরও বন্ধুতা হয় না কারও সঙ্গে; যেন তার মনের ভিতরে কোথায় একটু বরফ জমা রয়েছে; যেন অন্যের সুখে-দুঃখে সুখী হতে বা দুঃখ করতে জানে না।

সে বছরে, রাজ্যে অনাবৃষ্টি হল, নদী নদ গাছ লতা বন শুকাল। দুর্ভিক্ষ এল দেশে। মানুষরা না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে রইল কিছুদিন। মানুষের নিজের খাবার নেই, বেড়াল

কুকুরকে খেতে দেবে কোথা থেকে? সেগুলো ধুঁকতে ধুঁকতে পথে পথে খাবার খুঁজে বেড়াতে লাগল; রোগা, হাড্ডিসার হয়ে।

হিমুকে যে দেখাশোনা করত, সেই মেয়েটির নাম ছিল শুভবার্তা। একদিন হিমুর পাতে এক মুঠো ভাত পড়ে ছিল। শুভ সেই ভাতগুলো নিয়ে, রান্নাঘরের জানালা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিল। জানালা দিয়ে হিমু দেখতে পেল, দু'তিনটা কুকুর ছুটে এসে ভাতগুলো চেটে চেটে খেতে লাগল; দু' একটা বেড়ালও এসে যোগ দিল তাদের সঙ্গে।

পরদিন, হিমু পাতে একটু বেশী ভাত রেখে দিল, খেল না। শুভ বুঝতে পেরে সেই থেকে বেশী বেশী করে ভাত দিত হিমুর পাতে। তাই ক্রমেই কুকুর বেড়ালরা একটু পেট ভরে খেতে পেত। তারা রান্নাঘরের জানালার কাছে কাছে ঘুরত, রাত্রে জানালার নিচে শুয়ে থাকত। কুকুর বেড়ালের ভয় ভেঙ্গে গেল হিমুর।

একদিন হিমু দেখল, ছোট একটি মেয়ে এসে, কুকুরদের সঙ্গে ভাত কুড়িয়ে খাচ্ছে। হিমু তো অবাক, "এ কি? রাস্তার ভাত খায় কেন মেয়েটি?" তাকে ডাকল হিমু, জিজ্ঞাসা করল, "তুমি ও নোংরা ভাত খাচ্ছ কেন? বাড়িতে ভাত খাওনি?"

"না, বাড়িতে চাল নেই পরশু থেকে।"

"পরশু থেকে তবে খাওনি ভাত?"

"খাইনি। তার আগের দিন ফ্যানভাত খেয়ে ছিলাম।"

"কে আছেন বাড়িতে?"

"মা আছে। না খেয়ে খেয়ে মায়ের শরীর রোগা হয়ে গেছে, উঠতে পারে না।"

হিমু এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে হিমু? শরীর খারাপ লাগছে কি?"

"না মা। কিন্তু আজ থেকে তিন দিন আমি ভাত খাব না।"

"সে কি কথা? কেন খাবে না?"

"একটি মেয়েকে দেখলাম, তিন দিন ভাত খায় না। আমি জানতে চাই, তিন দিন না খেলে মানুষের কেমন লাগে।"

মেনকা আর কি বলবেন? তিনি শ্রীপতিকে গিয়ে বললেন কথাটা। শ্রীপতি বললেন, "ইচ্ছা যখন হয়েছে ওর না খেতে, না-ই খেল। এতে ওর পক্ষে ভালই হবে হয়ত।"

সুখের শরীর হিমুর, কষ্ট করা অভ্যাস নেই। দ্বিতীয় দিন সকালে সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল। তবু জল ছাড়া আর কিছু খেতে চাইল না।

তখন শ্রীপতি এসে আদর ক'রে বললেন, "হিমু মা, তুমি ভাত খাও। আজ আমি পাড়ার লোক সবাইকে বলে দিয়েছি যে, আজ থেকে দুই বেলা তারা আমার বাড়িতে এসে ভাত খাবে।"

"তখন তাহলে আমি খাব।" উত্তর করল হিমু।

বাড়ির হাতার ভিতরে মাঠ ছিল। সে মাঠ মাটি লেপে পরিষ্কার করা হল। সেখানে সারি সারি পাতা পড়ল। তরিতরকারি তো পাওয়া যায় না, ঘরের গোলার চাল ডাল

দিয়ে খিচুড়ি রান্না হয়েছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাঁড়ি দুইজন করে লোক বয়ে আনছে; তাই থেকে হাতায় হাতায় খিচুড়ি দেওয়া হচ্ছে সকলের পাতে। শ্রীপতিও পরিবেশন করছেন। জানালা দিয়ে মেনকা দেখালেন হিমুকে, আর তার মুখে খিচুড়ি তুলে দিলেন। হিমু খেল।

তারপর সে মায়ের সঙ্গে গেল সেই মাঠে। রোগা টিঙটিঙে ছেলেমেয়েগুলির পাতে হিমু খিচুড়ি দিচ্ছে, আর তার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ছে। তার মনের ভিতরে যে বরফটুকু জমে ছিল, চোখের জলে তা গ'লে বেরিয়ে গেল। পরের জন্য দুঃখ করতে শিখল হিমানী।

দৈত্যর ছেলে

মানুষদের দেশ ছিল সমান জমির উপরে। সেখান থেকে দেখা যেত, দূরে-নীল নীল উঁচু-উঁচু পাহাড়। সেই সব পাহাড়ে থাকত দৈত্যরা; এক একটা পাহাড়ে এক এক দৈত্যর বাড়ি।

সব চেয়ে কাছের পাহাড়টায় যে দৈত্য থাকত, সে মানুষদের দেশে এসে ভারি উৎপাত করত। দৈত্যরা রাক্ষস নয়, তারা মানুষ খায় না। কিন্তু দৈত্যটা এসে, মানুষদের ঘরের ছাত ভেঙ্গে, চালা উপড়িয়ে, ভিতর থেকে সুন্দর জিনিস যা দেখত নিয়ে নিত,—বড় বড় আয়না, আতর গোলাপজল, চন্দন তেল এই সব। ভাঙ্গা বাড়ির নিচে পড়ে মানুষ মারাও যেত। মানুষদের গরু ছাগল দৈত্য চুরি করে নিয়ে পালাত।

সেই মানুষদের দেশের এক গাঁয়ে, থাকত জয়রাম নামে এক বৈদ্য। বৈদ্য খুব ভাল ওষুধ দিতে পারত। লোকে তার কাছে দলে দলে আসত অসুখ সারাবার জন্য। বৈদ্যর বাড়িতে ছিল সে, তার স্ত্রী আর ছোট্ট দুটি যমজ ছেলে। যমজ ছেলে দুটিকে জয়রাম বলত, "এরা আমার কানাই আর বলাই।"

যে দৈত্যটা এসে মানুষদের উপর উপদ্রব করত, তার বাড়িতে অনেক দৈত্য, পাহারাদার কর্মচারী ছিল। কিন্তু সুখ ছিল না তার মনে; কেন না একটিও ছেলে কি মেয়ে ছিল না

তার। এক রাত্রে সে মানুষদের দেশে চুপচাপ এসে, এ গাঁ ও গাঁ, এ ঘর ও ঘর ঘুরতে লাগল; কি যেন খুঁজতে লাগল। তখন জয়রাম আর তার স্ত্রী, যমজ ছেলে দুটিকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। দৈত্য করল কি, বলাইকে তুলে নিয়ে দিল দৌড়।

দৈত্যের দৌড় কি সহজ ব্যাপার! ধুপ্ ধাপ্ শব্দ শুনে সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সবাই দেখল, কতগুলো ঘর, ঘরের কাছের গাছ ভেঙ্গে পড়েছে। বুঝল তারা, দৈত্যটা এসেছিল। আর, বৈদ্য আর তার স্ত্রী উঠে দেখল, বলাই নেই। খুব কান্নাকাটি করল দুজনে। কিন্তু কেঁদে তো কিছু করতে পারবে না; যে গেছে, তাকে ফিরে পাওয়া যাবে না। যেটি আছে, সেই শিশুটিকে দিনরাত আগলে রইল তারা। দিনের বেলা মা তাকে কোলে নিয়ে ঘরের কাজ করে। রাত্রে পালা করে বাবা মা পাহারা দেয়। এমনি দিন যায়।

কানাই যখন দশ বছরেরটি হল, তার বাবা একদিন অসুখে পড়ল আর মারা গেল। শেষ সময়ে সে কানাইকে বল্ল, "দ্যাখ্, তোর জন্য বাড়ি ঘর কিছুই তো রাখতে পারলাম না। সবই দৈত্য নষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু একটা খুব দামী জিনিস আমি তোর জন্য রাখলাম। ভিন্ গাঁয়ের এক জাদুকরের ছেলের অসুখ ভাল করেছিলাম। কয়দিন আগে সে আমাকে একটা চমৎকার জিনিস উপহার দিয়ে গেল; সবুজ রঙের একটা মস্ত চাদর; চাদরটাকে গায়ে জড়িয়ে, যেখানে যেতে চাওয়া যায়, সেইখানে যেতে পারা যায়। মানুষকে কেউ তখন দেখতে পায় না; গায়ে জড়ালে অদৃশ্য

হয়ে যায় মানুষ ও চাদরটা। তোর মায়ের কাছে আছে, চেয়ে নিস্।"

কানাই আরও বড় হয়েছে। মায়ের কাছে সে শুনেছে বলাইকে দৈত্য নিয়ে গেছে। ঐ ধোঁয়া-ধোঁয়া উঁচু পাহাড়টায় দৈত্যের বাড়ি। কানাইএর ভারি ইচ্ছা হয় ওখানে যেতে, বলাইকে দেখতে, আর, যদি পারা যায়, তাকে নিয়ে আসতে।

একদিন সে মাকে মনের কথাটা খুলে বল্ল। মা বললেন, "না রে বাপ্। গিয়ে কাজ নেই। একটিকে হারিয়েছি, আবার তোকেও হারাব।"

"হারাব কেন আমি? চাদর গায়ে দিয়ে যাব, কেউ দেখতে পাবে না আমায়। যদি সুবিধা করতে না পারি, অমনি অমনি ফিরে আসব। শুধু দেখে আসব ভাইকে।"

দুদিন খেল না দেল না কানাই, মন খারাপ করে শুয়ে রইল। মা আর কি করে, চাদরখানা এনে দিল কানাইয়ের হাতে।

এদিকে, দৈত্য বলাইকে এনে ভারি যত্নে রেখেছে। বলাইও সুখে আছে। বাড়ির কথা, মা বাবা ভাইএর কথা তো তার মনেই নেই।

কানাই যখন চাদরখানা গায়ে দিয়ে পৌঁছাল দৈত্যের বাড়ি, তখন কিসের যেন গোলমাল চলেছে সেখানে।

হয়েছে কি, সেইদিন সকালে, একটা পাথরে পা হড়কিয়ে, দৈত্য গড়িয়ে পড়েছিল পাহাড়ের নিচে। তার লোকজন

তাকে ধরাধরি করে এনে বিছানায় শুইয়েছে। কানাইকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। সে দৈত্যর ঘরে গিয়ে দেখল দৈত্য অজ্ঞানের মত পড়ে আছে, আর বলাই তার গায়ে হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করছে, কোথায় চোট লেগেছে, কি হয়েছে। বলাইকে দেখে কানাই, 'বলাই' বলে ডাকতে যাচ্ছিল, কোনও রকমে সামলিয়ে নিল নিজেকে।

খানিক বাদে, দুইজন কর্মচারীকে ডেকে বলাই বল্‌ল, "এখানে থাক তোমরা। আমি পশ্চিম পাহাড়ের বৈদ্যর বাড়ি যাচ্ছি ওষুধ আনতে।"

তারপর অনেক দূরের পশ্চিম পাহাড়ের দিকে চলে গেল। এই সুযোগে কানাইও দেখা দিল। গায়ের চাদরটা রেখে দিল মাটিতে। চাদরটা কিন্তু, একবার ব্যবহার করতে আরম্ভ করলে, অন্যের কাছে অদৃশ্যই থাকে; যে ব্যবহার করে সে শুধু দেখতে পায়। কাজ সেরে ফিরে এলে, আবার যে চাদর, সেই চাদর।

যে কর্মচারী দুজন দৈত্যর কাছে বসেছিল, তাদের কানাই বল্‌ল, "বৈদ্যকে ডাকতে একটু পরে যাব। এ কাতরাচ্ছে যখন, হয়ত জ্ঞান হবে। কোথায় বেদনা ভাল ক'রে জানা দরকার। বৈদ্য সেই বুঝে ওষুধ দেবে। তোমরা এখন যাও। একটু বাদে ডাকব আমি।"

কানাই শুনেছিল, দৈত্যরা অমনি মরে না, তাদের প্রাণ লুকানো থাকে। কোথায় লুকানো তার সন্ধান পেলে, তাদের মারতে পারা যায়। কর্মচারীরা চলে গেলে, দৈত্যর কাছে ব'সে, কাঁদবার ভান করে খুব ফোঁপাতে লাগল কানাই।

তাই শুনে দৈত্য চোখ চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কাঁদিস্ কেন?"

"তুমি যদি মরে যাও, কি হবে?"

দৈত্য একটু হাসল, জড়িয়ে জড়িয়ে, থেমে থেমে বলল, "দূর বোকা! আমি কি অমনি মরি? আমার প্রাণ-পাখিকে পাকড়াও করলে, তবে আমি মরব।"

"সে আবার কি?"

পূবদিকে, এই পাহাড়ের পায়ের কাছে, প্রকাণ্ড পাথর চাপা আছে একটা গর্তের মুখে। সেই গর্ত চলে গেছে পাতালে। সেখানে, সাপরাজার মাথার মণি একটা হীরের পাখি। সেই পাখিই হল আমার—"

কথা শেষ হল না তার, আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

কানাই তখন উঠে, লোক দুজনকে ডেকে দিয়ে, চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে ছুটল পশ্চিম পাহাড়ের পথে। পথের ধারে একটা গাছের নিচে সে অদৃশ্য হয়ে বসে রইল। খানিক পরে বলাই উপস্থিত। বলাই কাছে আসতে, কানাই তার সামনে দাঁড়াল। চমকে উঠে বলাই জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে? কোথা থেকে এলে?"

কানাই তাকে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌ল, "বলাই, আমি তোর ভাই কানাই। আমরা দুই ভাই, বলাই কানাই, একসঙ্গে জন্মিয়ে ছিলাম। দৈত্য তোকে ছোট্ট বেলায় চুরি করে এনেছিল।"

"ভাই তুমি? আমি কি তোমার মতন? আমরা মানুষ?"

"হ্যাঁ, আমরা দুজন মানুষ, দৈত্য নয়।"

"তা তো বুঝতেই পারি। তুমি ছিলে কোথায়? এখানে কেন এলে? শীঘ্র বল। এখনি বৈদ্য এসে পড়বে। সে ওষুধ দেয়নি, বলেছে নিজে দেখে চিকিৎসা করবে।"

"মায়ের কাছে তোর কথা শুনে, তোকে নিয়ে যেতে এসেছি আমি। শোন্ আমার পরামর্শ। এখনি চলে আয় আমার সঙ্গে।"

"কিন্তু আমি চলে গেলে দৈত্যর ভারি দুঃখ হবে। সে খুব ভালবাসে আমাকে। আমিও তাকে ভালবাসি।"

"মায়ের কথা ভাববি না? মা যে তোকে হারিয়ে আধ-মরা হয়ে আছে। তা ছাড়া, এই অদ্ভুত দেশে একলা একলা বরাবর থাকবি? সঙ্গী নেই সাথী নেই!"

"আমাকে একটু ভাবতে দাও। তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমি যদি এসে যাই, দু'জনে দেশে যাব।" বলে দৈত্যর কাছে গেল বলাই। তখনি এসে পড়ল বৈদ্য। সে দৈত্যকে নেড়েচেড়ে দেখছে, ওষুধ দিচ্ছে, তার ভাঙ্গা পায়ে কাপড় জড়াচ্ছে। দৈত্য অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে। বাড়ির সবাই সেই ঘরে জড়ো হয়েছে।

ইতিমধ্যে বলাই চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ল, আর তাড়াতাড়ি চলে গেল কানাইএর কাছে। কানাই তাকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে, পালালো দেশে। তাদের মা, কানাইএর আশায় পথ চেয়ে দরজায় বসেছিল। দুজনকে আসতে দেখে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল। চারিদিক থেকে গ্রামের লোকরাও ছুটে এল।

একটু স্থির হয়ে যখন দুই ভাই মায়ের কাছে ঘরে বসল, বলাই বল্‌ল, "কিন্তু ভাই, দৈত্য যখন দেখবে আমি নেই, সে কি তোমাদের রেহাই দেবে? সে এসে গ্রাম ছারখার করে দেবে। আমাকে তো নিয়ে যাবেই।"

কানাই উত্তর দিল, "তা ঠিক। তবে এক কাজ করা যাক। আজ রাত ভোর হতে, আমরা তিনজনে কোনও দূর দেশে চলে যাই। দৈত্য এখনি কিছু করতে পারবে না। এখানে আসবার মত সেরে উঠতে তার এখনও দেরি আছে।"

"তবে তাই।" বল্‌ল বলাই। রাত ভোর হতে, তারা তিনজনে বেরিয়ে পড়ল চাদর মুড়ি দিয়ে। অনেক অনেক দূরে, এক সুন্দর শহর দেখে, নেমে পড়ল তারা।

ঐ সময়ের মধ্যেই, গ্রামের লোকেরা কানাইএর কাছ থেকে জেনেছিল, কোথায় দৈত্যর প্রাণ লুকানো আছে। এ আপদকে রাখলে চলবে না। তাই, পরামর্শ ক'রে, গ্রামের যত জোয়ান জোয়ান সাহসী লোক, সবাই প্রস্তুত হল পাতালে যাবার জন্য। গুহার মুখের পাথরখানা সরাবার জন্য, দেশে যত হাতী ছিল, সব তারা নিল সঙ্গে। যত ওঝা যত সাপুড়ে ছিল সবাই চল্‌ল তাদের সঙ্গে।

এদিকে সেই সুন্দর শহরে কানাই বলাই এক দোকানে কাজ নিয়েছে। দোকানের একটা ঘরে, মাকে নিয়ে থাকে তারা। কিন্তু, কয়দিন বাদে মায়ের মন চঞ্চল হল। সে বল্‌ল, "দ্যাখ্, আমার মন মানছে না। গাঁয়ের লোকদের

বিপদের মধ্যে ফেলে, আমি এখানে সুখে আছি, স্বার্থপরের মত।"

"তুমি গিয়েই বা কি করবে?" জিজ্ঞাসা করল ভাই দুজন।

"কিছু করবার থাকলে করব। নয়তো, অন্ততঃ বিপদ এলে তাদের সঙ্গে থাকতে পারব। আমাকে তোরা সেখানে পৌঁছিয়ে দিয়ে চলে আয়। তোদের পক্ষে সে জায়গা নিরাপদ হবে না।"

এই ব্যবস্থাই ঠিক হল। পরদিন সন্ধ্যাবেলা গিয়ে পৌঁছাল তারা গ্রামে। গিয়ে ছাখে, গ্রাম অর্ধেক খালি। শুনলো বড়-বড়রা সবাই মিলে গেছে পাতালপুরে। বাকি যারা আছে, তারা সেই লোকদের অপেক্ষায় রয়েছে। বেঁচে ফিরবে কিনা কে জানে। রোজ সকালে সবাই জড়ো হয় মাঠে, চেয়ে থাকে পাহাড়ের দিকে। রাত্রেও পাহারা থাকে।

খবর শুনে, বলাই দৌড়ে এসে কানাইকে বল্‌ল, "ভাই, তোর পায়ে পড়ি, আমাকে দৈত্যর কাছে রেখে আয়। এমন বিপদে আমি তার কাছে নেই। এ হতে পারে না। অন্ততঃ বিপদের কথা জানিয়ে দিই তাকে।"

সে এত মিনতি করতে লাগল যে, কানাই রাজী হল শেষে, পরদিন সকালেই দৈত্যর বাড়ি পৌঁছে দিতে বলাইকে। পরদিন সকাল হতে না হতে, কানাই চাদর-খানা নিয়ে আর বলাইকে নিয়ে বেরিয়ে এল। বাইরে তখন হুলুস্থূল লেগে গেছে। সবাই দেখছে, লাঠির মত করে

হঠাৎ দৈত্যটা উল্টে পড়ে গেল।

দুটো তালগাছে ভর দিয়ে, ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে চ্যাচাতে চ্যাচাতে দৈত্য নামছে পাহাড় দিয়ে! ভয়ে সকলে আঁতকে উঠল। সকলেরি মুখ চুন, বুক দুরদুর করছে। হঠাৎ, দৈত্যটা উল্টে প'ড়ে গেল, আর দূর আকাশে উড়ে গেল একটা জ্বলজ্বলে হীরের পাখি !!

সবাই হাত তুলে নাচছে, হাসছে, হো হা করছে আনন্দে। তাদের পিছনে ব'সে, দুই হাতে চোখ ঢেকে কাঁদছে বলাই।

তুফান

সমুদ্রের কাছাকাছি এক গ্রাম। গ্রামের নাম সাগরডাঙ্গা। সেখানের লোকেরা ডিঙ্গি বেয়ে সমুদ্রে যায়, কাঁকড়া গুগলি মাছ নিয়ে আসে; আর আনে নানা রকম শামুক ঝিনুক শঙ্খ। গ্রামের শাঁখারিরা ছোট শাঁখের মালা গাঁথে, বড় শাঁখ কেটে সুন্দর নক্সা করা শঙ্খের বালা তৈরী করে। চাষবাসও করে তারা। তাদের কারোরই খাওয়া পরার কষ্ট নেই।

জগমোহন বড় ভাই; তার নিচে একে একে চারটি বোন। বোনেদের বেশ কয়েক বছর পরে হয়েছে দুটি ভাই, হরিমোহন আর হারাধন।

জগমোহন ধর্মকর্ম নিয়ে থাকে। তার সংসারে, দুটি ছেলে প্রভাস ও বিকাশ, আর মেয়ে সারদা। প্রভাস আর বিকাশ কাকাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। হরিমোহন আর হারাধন যখন ডিঙ্গি বেয়ে সমুদ্রে যায়, তারাও যায়।

সাগরপারে ঝড়-তুফানের অভাব নেই। ঝড় আরম্ভ হলে ডিঙ্গি সব ফিরে আসে তীরে। কিন্তু একবার ভীষণ কাণ্ড হল। হরিমোহন হারাধন প্রভাস বিকাশ সমুদ্রে গিয়েছিল; সেই সময়ে উঠল ভয়ঙ্কর ঘূর্ণি বাতাস। জল ছিটকে গিয়ে ঠেকল আকাশে। বাতাস হু হু করে ছুটে চল্‌ল, সামনে যা কিছু পেল সব ঠেলে উড়িয়ে নিয়ে। হরিমোহনরা চারজন যে কোথায় গেল, কেউ জানল না। তারা আর ফিরে এল না।

জগমোহন ব'সে থাকে খাটে। তাকে ঘিরে থাকে তার মেয়ে বারো বছরের সারদা, আর হরিমোহন ও হারাধনের ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা, শ্রীধর মহীধর ভূষণ কিরণ অণু কণা বীণা।

ছোট ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞাসা করে, "বাবা কাকা কোথায়, জেঠু? প্রভাসদা বিকাশদা কোথায় গেল?"

জগমোহন চোখের জল ফেলে আর বোঝায়, "তারা কিনা সমুদ্রকে বড্ড ভালবাসত, তাই সাগর দেবতা তাদের নিজের কাছে নিয়ে গেছেন।"

শ্রীধর আর মহীধর বলে, "আমরাও সমুদ্রকে ভালবাসি। বড় হলে আমরাও ডিঙ্গি নিয়ে সমুদ্রে যাব।"

ভূষণ কিরণ যোগ দেয়, "আমরাও।"

সারদা ধমকে ওঠে, "কি করতে যাবি সমুদ্রে? আমি তবে খেলা করব কার সঙ্গে?"

"ঐ অণু বীণা কণা এদের সঙ্গে খেলো।"

"ধেৎ, ওরা কিছুই খেলতে জানে না, নেহাৎ ছোট।" উত্তর দেয় সারদা।

এর পরে হরিমোহনের বৌ বেশীদিন বাঁচল না। হারাধনের বৌ ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করে, চুপচাপ থাকে।

শ্রীধর মহীধরকে চালাবার মত অভিভাবক কেউ নেই। তারা গ্রামের টোলে পড়াশোনা করে, ঘুড়ি ওড়ায়, পায়রা ওড়ায়। ভূষণ কিরণও তাদের সঙ্গে জোটে। শ্রীধরের অনেক পোষা পায়রা আছে। তাদের মধ্যে একটি পায়রা

শ্রীধরকে ছাড়ে না; কাঁধে বসে, সঙ্গে সঙ্গে ওড়ে। মহীধরের আছে পোষা কুকুর ভুলো। ভুলোও ঘোরে তার পিছনে পিছনে। সুবিধা পেলেই ভাইরা সকলে পাড়ার লোকদের সাহায্য করে। সবাই ভালবাসে ভাইদের।

সাগরডাঙ্গার আশেপাশে আরও গ্রাম ছিল। শহরও ছিল একটা, সেখানে জমিদার থাকতেন। একরাতে ডাকাতি হয়ে গেল গ্রামে গ্রামে। যাদের বাড়িতে কিছু টাকা জমা ছিল, সব চুরি গেল। জমিদার বাড়ির যত রূপোর বাসন, শাল আলোয়ান, দামী দামী জিনিসপত্র সমস্তই হল লুটপাট। রাত্রে নাকি একটা ডিঙ্গি এসে সমুদ্রে দাঁড়িয়েছিল। শেষে জানা গেল, সেটা ছিল দস্যুদের ডিঙ্গি। সকলে হায় হায় করল অনেক দিন পর্যন্ত।

শ্রীধর মহীধরদের একটা নতুন কাজ জুটেছে। সওদাগরের মস্ত পালতোলা ডিঙ্গা আসে। বড় ডিঙ্গা তীরের কাছে ভিড়তে পারে না, দূরে দাঁড়ায়। শ্রীধর মহীধর ভূষণ কিরণ—এরা, ডিঙ্গি ক'রে নিজেদের গ্রামের তৈরী শাঁখা, মালা, হাতে-গড়া মাটির ও পিতলের তৈরী মূর্তি নিয়ে যায়, সওদাগরদের কাছে বিক্রী করে। আর কিনে আনে ভাল ভাল শাল আলোয়ান কাপড়-চোপড়, এলাচ লবঙ্গ মশলা, চন্দন কাঠ। দামী জিনিসগুলি কিনে নেন গ্রামের জমিদার। বেশ দিন কাটে।

হারাধন ও হরিমোহনরা হারিয়ে যাবার পরে, গড়িয়ে গেছে ত্রিশটি বছর। ত্রিশ বছরে, বাড়ির মেয়েরা অনেকেই

শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। যারা ছোট্টটি ছিল, তারা বড় হয়েছে কত। শ্রীধররা চার ভাই এখনও যায় নৌকো বেয়ে সমুদ্রে।

যেমন যায়, তেমনি গিয়েছিল একদিন। মাছ ধরছিল তারা। কিন্তু মাছ ধরবার জালখানা আর ওঠানো হল না। দেখা দিল সর্বনাশ। আবার সেই ভয়ঙ্কর তুফান। বাতাস শ্রীধর মহীধরদের ডিঙ্গিখানা কাগজের নৌকোর মত উড়িয়ে নিয়ে চল্‌ল, সমুদ্রের তোলপাড় ঢেউএর উপর দিয়ে।

ভাইরা চারজনে তুই হাতে শক্ত করে ধরে আছে ডিঙ্গির কাঠ। কোনও রকমে নিজেদের কাপড়ে কাপড়ে জড়িয়েছে। পায়রাটা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ঢুকেছে গিয়ে শামুক ঝিনুকের থলিতে। ভুলো কুকুর মুখ থুবড়িয়ে পড়ে আছে মহীধরের তুই পায়ের মধ্যে।

বাতাসের জোর কমেছে, থামেনি এখনও। দূরে দেখা যায় জলের মাঝে একটা কালো দাগ। সেদিকে চেয়ে থাকে ডিঙ্গির মানুষেরা। ক্রমে কাছে আসে সেটা। ক্রমে বোঝা যায়, ওখানে সমুদ্রের মাঝে দ্বীপ আছে; পাহাড়ের মত হয়ে জল থেকে উঠেছে; মাথার উপরটায় সমান জায়গা।

ধুম্ করে লাগল গিয়ে নৌকো দ্বীপের গায়ে। নিচের পাটাতন খসে গেল। লাফিয়ে পড়ল চারজন পাহাড়ের ঢালু পাড়ে। সমুদ্রের জল ভাসিয়ে নিল নৌকোটাকে। কুকুরটাও লাফিয়ে পড়েছে। পায়রার থলি আছে শ্রীধরের হাতে।

অমনি ছুটে এল তাদের কাছে চারজন মানুষ!

তারা জিজ্ঞাসা করল, "ঝড়ে উড়িয়ে আনল বুঝি? কোথা থেকে আসছ তোমরা?"

"সাগরডাঙ্গা থেকে আসছি আমরা।" উত্তর দিল চার ভাই।

"সাগরডাঙ্গা? সে যে আমাদের গ্রাম।" বলে তারা জড়াজড়ি করে আদর করতে লাগল নতুন লোকদের। একটু স্থির হতে, প্রশ্ন করল, "নাম কি তোমাদের? কার ছেলে তোমরা?"

শ্রীধর বল্‌ল, "আমাদের বাবার নাম হরিমোহন; এই আমি আর শ্রীধর। এই ভূষণ কিরণ, হারাধন কাকার ছেলেরা।"

"এঁ্যা!! কি বল্‌লি? ওরে এই তো আমি হরিমোহন, এই হারাধন, প্রভাস, বিকাশ। ওরে তোরা যে আমাদের মাণিকরা, সোনা ধনরা! আয় আয়। কি আশ্চর্য ব্যাপার! এমন সুখও হয় মানুষের!"

এর মধ্যে চারিদিকে 'কে, কে?' রব শুনে চার ভাই এদিকে ওদিকে চাইছে।

হরিমোহন হেসে বল্‌ল, "ওরা আমাদের টিয়া ময়না। পোষা সব। এই বিজন বনে ওরাই সঙ্গী। কথা বলতে শিখিয়েছি। অনেক সাহায্য করে আমাদের।"

সকলে মিলে বসল একখানে। কথা তাদের শেষই হয় না। বাবারা আর দাদারা, জগমোহনের কথা, বাড়ির আর-সকলের কথা, হাজার বিষয়ে হাজার প্রশ্ন করতে লাগল। এমনি করে কাটল দিন তুই। কি করে ফেরা

যাবে, সেই পরামর্শ হতে লাগল তারপর।

শ্রীধর বল্‌ল, "আমার পায়রার পায়ে যদি একটা চিঠি বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে সে ঠিক নিয়ে গ্রামে, আমার পায়রার খোপে পোঁছবে। যখন আমি সমুদ্রে যাই, আমাদের কানু পানু ফণি এরা দেখাশোনা করে পায়রাগুলোর। তারা ঠিক চিঠিখানা খুলে নেবে। বরং পায়রাটার গায়ে একটু হলুদ কি কিছু রং মাখিয়ে দিলে, সহজে চোখে পড়বে।

তাই করা হল। চিঠি নিয়ে পায়রা উড়ে চলে গেল সাগর ডাঙ্গার উদ্দেশে।

"বাবা, তোমরা কেমন ক'রে এখানে উঠলে, কেমন ক'রে এতদিন রইলে, বল না?"

"কেমন ক'রে উঠলাম? যেমন ক'রে তোরা উঠলি। তবে, ঝড়ে আমাদের নৌকোসুদ্ধ একেবারে ডাঙ্গায় উড়িয়ে নিয়ে ফেলেছিল। ভাগ্যে মাছধরা জালখানা চারজনে জড়িয়ে ছিলাম গায়ে, তাই হাড়গোড় ভাঙ্গেনি। তবু, চোট লেগেছিল খুব, এখানে ওখানে। অজ্ঞান হয়ে রইলাম চারজনেই, কতক্ষণ জানি না। জ্ঞান হলে পরে, আস্তে আস্তে উঠে, খাওয়া থাকা সবেরই বন্দোবস্ত করতে লেগে যেতে হল। নৌকো তো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেছে। দু' একখানা কাঠের পাটা কূলের কাছে ভাসছে দেখলাম; দু' একটা শামুক ঝিনুকের থলিও পড়ে-ছিল সেগুলি যোগাড় করা হল। কিন্তু, যন্ত্রপাতি কিছু নেই যে, কাঠ কাটব, ঘর বানাব।

"প্রথমে, দিনে গাছের ছায়ায়, আর রাত্রে গাছের উপরে

থাকতাম। জন্তু জানোয়ার এখানে দেখিনি বিশেষ। তবু ভয় ভয় করত। আছে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া ময়না বুলবুলি, নানারকম পাখি। হাঁসের ঝাঁকও আসে।

"কাঠের পাটা যা ছিল, কোনও মতে লতা দিয়ে সেগুলিকে গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে নিলাম। এই হল রাত্রে শোবার খাট। মাছধরার জালটাও দোলার মত ক'রে বেঁধে নিলাম গাছের দুটো ডালে। সেটাও হল ঘুমোবার জায়গা। জংলী মানুষের মত এই রকম রইলাম কিছু দিন। তারপর কি হল, শোন।"

হারাধন প্রভাস বিকাশও কথায় যোগ দিচ্ছিল। সকলের কাছ থেকে, গল্পের মত কাহিনী যা শ্রীধররা পেল, তা এই।

দ্বীপে আসবার মাস দুই পরে, এক সন্ধ্যা বেলা একখানা ডিঙ্গি এসে দ্বীপের কাছে দাঁড়াল। হরিমোহনরা মনে কর-লেন এইবার লোক এসেছে, এইবারে তাঁরা উদ্ধার পাবেন। মনটা খুশি হয়ে উঠল। কিন্তু তবু, গাছের ডালে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন, কারা এল, কি ব্যাপার, দেখবার জন্য। একটু অন্ধকার হলে, কতগুলো লোক নামল নৌকো থেকে। তাদের চেহারা কেমন সন্দেহজনক, কেমন কেমন পোশাক-আশাক। তাই তো!

লোকগুলো দুজন দুজন ক'রে, বড় বড় বাক্স বয়ে আনল। তারপর, মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার ভিতর বাক্সগুলো পুঁততে আরম্ভ করল। হরিমোহনরা আস্তে আস্তে বলাবলি করছেন, "এদের যে চোর ডাকাত ব'লে মনে হচ্ছে। এরা কারা কে জানে?"

অমনি, ডালের উপরে যত টিয়াপাখি ছিল, একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "কারা ? কারা ? কারা ?"

দস্যুরা চমকে উঠে, যন্ত্রপাতি ফেলে, চারিদিকে একবার চাইল ; তারপর কাউকে দেখতে না পেয়ে, সবাই মিলে ভোঁ ভোঁ দৌড় দিয়ে ডিঙ্গায় উঠে তাড়াতাড়ি বেয়ে চল্‌ল ডিঙ্গা।

দস্যুরা চমকে উঠে সবাই মিলে ভোঁ দৌড় !

রাতটা হরিমোহনরা গাছের উপরেই রইলেন। ভোর বেলা নেমে এসে দ্যাখেন, ডাকাতেরা অনেক কিছু ফেলে পালিয়েছে। শাবল খন্তা ছেনি কুড়ুল এসব তো আছেই ; চকমকি পাথর আছে। আর গর্তের ভিতরে অর্ধেক পোঁতা আছে বড় বড় বাক্স। সেগুলো তাঁরা খুলে দেখেননি।

চুরি করা ডাকাতি করা মাল ছুঁলেও পাপ। কেবল গর্তের উপর মাটি চাপা দিয়ে রেখেছেন।

সব শুনে মহীধর বল্‌ল, "জান বাবা, তোমরা হারিয়ে যাবার কিছুদিন পরেই আমাদের সাগরডাঙ্গার গ্রামে আর জমিদার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল এক রাতে। এরা সেই ডাকাতরা বলে মনে হচ্ছে। এসব জিনিস তো তাহলে গ্রামের লোকেরই।"

হারাধন বললেন, "তা হতে পারে। খবর পেলে, জমিদারের লোক হয়ত আসবে ডিঙ্গা নিয়ে।"

হরিমোহন বললেন, "খুব সম্ভব। সেই যন্ত্রপাতি পেয়ে আমরা কাঠ কাটলাম, মাটি খুঁড়লাম, এই যেসব ঘরে আমরা রয়েছি, তোমরা এসে আছ, এই ঘরগুলি তৈরী করলাম। দিন কাটছিল একরকম, কেবল বড় একলা।"

ভুলো কুকুরের কাজ ছিল দ্বীপের ধারে ধারে ঘুরে বেড়ানো, সাপ কি শুশুক দেখতে পেলে ঘেউ ঘেউ করা, এবং রাত্রে পাহারা দেওয়া। মাঝে মাঝে সে দূর সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকত। কি দেখত কে জানে। কুকুরের দৃষ্টি খুব প্রখর।

এক সকালে ভুলো সমুদ্রের দিকে চেয়ে, চঞ্চল হয়ে ছুটে বেড়াতে লাগল আর ডাকতে থাকল। তারপরে, ক্রমে দেখা গেল বড় বড় পাল তোলা ডিঙ্গা, ঢেউ ভেঙ্গে আসছে দ্বীপের দিকে। সাগরডাঙ্গার ডিঙ্গা ছিল সেগুলি। সবাই মিলে সেই ডিঙ্গা চড়ে ফিরলেন গ্রামে।

তারপর ? তারপর আর কি ? বুড়ো জগমোহনকে

ঘিরে, ছোট বড় নতুন পুরানো, ভাই ছেলে নাতি, সবাই বসল। জগমোহন হেসে কেঁদে সকলের সঙ্গে কথা বললেন। তার পরে তিনি দুই হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "দয়ার ঠাকুর।" আর সকলেও হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল।

গন্ধমাদন পর্বত

গন্ধমাদন পর্বতের নয়টা চূড়ো। এক চূড়োয় থাকে গন্ধর্বেরা। তারা সব দেবতাদের কাছে গান করে। দিন রাত তারা নেচে গেয়ে কাটায়। আরেক চূড়োয় থাকে যত পাখিরা,—কাক বক কাদাখোঁচা খঞ্জন মাছরাঙ্গা কাকাতুয়া টিয়া শকুন সাঁচান পেঁচা এরা। আরেক চূড়োয় থাকে যত জন্তু জানোয়ার। আরেক চূড়োতে আছে যত বড় বড় গাছ, শাল শিমুল দেবদারু পিয়াশাল। আরেক চূড়োয় নদী বইছে; সে নদীর ধারে যত ওষুধের গাছ। অন্যান্য চূড়োয় দেবতাদের ঘর।

এই গন্ধমাদন পর্বতে, পাখিদের চূড়োয়, পেঁচা-পেঁচীর কোটরে ছিল এক পেঁচার ছানা। তার মনে ভারি দুঃখ। রাত্রে সে ঘুরে বেড়ায়, খায়-দায়। কিন্তু দিনের বেলা বেরোলেই অন্য পাখিরা তাকে তাড়া করে। তাই পৃথিবীটা কেমন, তা তার দেখাই হয় না। মনের দুঃখে তার গোল গোল চোখ দিয়ে জল গড়ায়।

এক রাত্রে, বেঙ্গমীর ছানা এসে তাকে বল্‌ল "ভাই, তুমি কাঁদছ কেন?"

পেঁচার ছানা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে ভাই?"

"আমি বেঙ্গমীর ছানা।"

"কোথা থেকে এলে?"

"নিদ্‌শহরে আমার বাড়ি, সেখান থেকে এলাম।

তুমি কেন কাঁদছ আমায় বল।"

পেঁচার ছানা উত্তর দিল, "আমার ভারি ইচ্ছা হয় দিনের বেলা ঘুরে ঘুরে দেশটা দেখি। কিন্তু তা আর পারি না। দিনে বেরোলেই অন্য পাখিগুলো আমায় তাড়া করে। একদিন ভোর রাতে গিয়ে লুকোলাম গন্ধর্বদের পাহাড়ে। গন্ধর্বরা একটা মস্ত গাছের নিচে বসে গান বাজনা করছিল। আলো ফুটতে, আমি যেই বেরোলাম, অমনি তাদের রাজা হা হা হু হু লাঠি নিয়ে তেড়ে এল আমাকে মারতে। ভাগ্যে বড় গাছটায় একটা কোটর ছিল, আমি তাড়াতাড়ি তার ভিতরে ঢুকে পড়লাম। সেই জন্য আমি কাঁদছি।"

বেঙ্গমীর ছানা বল্‌ল, "আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে দেশ বেড়িয়ে আনব। আমার সঙ্গে থাকলে কেউ তোমাকে কিছু বলবে না।"

সেই থেকে, পেঁচার ছানা আর বেঙ্গমীর ছানায় ভারি ভাব। বেঙ্গমীর ছানা তাকে নিয়ে দিনের বেলা দেশ দেখতে বেরোয়। রাত্রে কিন্তু তারা ফিরে আসে নিজেদের চূড়োয়। গন্ধমাদন পর্বতের নিয়ম এটা।

পেঁচার ছানা বন্ধুর সঙ্গে একদিন শাল-পিয়াশালের বনে ঘুরে এল। মস্ত মস্ত গাছ সেখানে, নিচে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। আরেক দিন গেল তারা নদীর ধারে। জলের দুই কিনারায় ওষধির গাছ। সেখানে ওষুধের গন্ধে সাপ ব্যাঙ টিকতে পারে না। জন্তু জানোয়ারের পাহাড়ে ঘুরে এল তারা। সে পাহাড়ে হাতী ঘোড়া বাঘ ভালুক থাকে।

কিন্তু সেই রাতে, বাড়ি ফিরতেই, পৃথিবী যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। গন্ধমাদন পর্বত, নয়টা চূড়ো সুদ্ধ হুস্ ক'রে উঠে গেল আকাশে। কি ব্যাপার? পেঁচার ছানা আর তার বন্ধু তখন গল্প করছিল। তারা দেখল একটা প্রকাণ্ড হনুমান, গোটা পাহাড়টা টেনে তুলে্ নিয়েছে। হনু-মানের মাথা গিয়ে আকাশে ঠেকেছে। হাত-পাও তেমনি প্রকাণ্ড।

অনেক অনেক দিন বানরটা পাহাড় নিয়ে চল্‌ল। চারি-দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। রাত আর শেষ হয় না। আশ্চর্য হয়ে ভাবছে পাখি বন্ধুরা, সকাল হবার সময় হয়েছে, সূর্য উঠছে না কেন?

ইঁদুর ব্যাঙ খেয়ে খেয়ে পেঁচার পেট ঢাক হয়ে গেল। বেঙ্গমীর ছানা অমৃত না কি খেয়ে আসে; তার খিদে পায় না।

অনেক অনেক দিন পরে, শেষে হনু পৃথিবীতে নামিয়ে দিল গন্ধমাদনকে। বেঙ্গমীর ছানা বল্‌ল, "বন্ধু, তুমি এখানে থাক। আমি দেখে আসি কারা এল পাহাড়ে।"

বেঙ্গমীর ছানার পৃথিবীতে যাওয়া আসা আছে। সে জানে, রাক্ষসদের রাজা রাবণ, অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের রাণী সীতাকে ধরে এনেছিল। তাইতে, রাক্ষসদের সঙ্গে রামচন্দ্র ও তাঁর বানর সৈন্যদের খুব যুদ্ধ বেধেছিল। সে দেখল, পৃথিবীতে বসে অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র কাঁদছেন। পাশে তাঁর ভাই লক্ষ্মণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। রাক্ষসেরা লক্ষ্মণকে শক্তিশেল মেরেছে। রাজবৈদ্য সুষেণ, গন্ধমাদন

পর্বতে নদীর ধারে ওষধির বনে এসে, বিশল্যকরণী নামের লতা তুলে নিলেন ; সোনার রঙের লতা, তার নীল রঙের ফুল। সেই নীল ফুল বেটে, সুষেণ তার রস শুঁকিয়ে দিলেন লক্ষ্মণকে। অমনি লক্ষ্মণ চোখ চেয়ে উঠে বসলেন। সকলের কি আনন্দ তখন।

হনুমান এক হাতে গন্ধমাদন পর্বত এনেছিল। বেঙ্গমীর ছানা দেখতে পেল, হনুমান অন্য হাতের বগলের নিচে কি যেন চেপে রেখেছে ; সেখান থেকে আলো বেরোচ্ছে।

রাম জিজ্ঞাসা করলেন হনুমানকে, "তোমার হাতের নিচ থেকে আলো বেরোচ্ছে কেন ? ওখানে কি আছে ?"

হনুমান হাসতে হাসতে উত্তর দিল, "বৈদ্য সুষেণ কিনা বলে ছিলেন, রাত্রের মধ্যে বিশল্যকরণী লতা আনতে হবে, রাত্রের মধ্যে লক্ষ্মণ ভাইকে বাঁচাতে হবে, সূর্য উঠলে সে মরে যাবে, তাই আমি যখন বিশল্যকরণী লতা খুঁজে পেলাম না, তখন গোটা গন্ধমাদনকেই তুলে নিলাম। পাহাড় নিয়ে শূন্যপথে আসবার সময়ে রাবণ রাজা উপর দিকে চেয়ে আমাকে দেখতে পেল। সে বুঝতে পারল, আমি ভাই লক্ষ্মণকে বাঁচাবার ওষুধ নিয়ে যাচ্ছি। অমনি সে পাঠিয়ে দিল কালনেমি রাক্ষসকে আমায় আটকাতে। কালনেমিকে শেষ করলাম। সূর্য উঠলে লক্ষ্মণ ভাই আর বাঁচবে না রাবণের জানা আছে। তখন রাবণ সূর্যকে হুকুম করল রাত ছুটোয় গিয়ে উদয় হতে। সূর্য আমাকে বলেছিল একথা। আমি যখন দেখলাম সূর্য উঠতে যাচ্ছে, মানা করলাম তাকে। কিন্তু সে রাবণকে ভারি ভয় করে কিনা, কিছুতেই আমার

গোটা গন্ধমাদনকেই হনুমান তুলে নিল।

কথা শুনছিল না। তাই আর কি করি? এক হাতে পাহাড়টা ধরে, অন্য হাতের নিচে তাকে চেপে নিলাম।”

রাম বললেন, “এখন তো লক্ষ্মণ বেঁচেছে, এখন সূর্যকে ছেড়ে দাও।”

হনুমান দুই হাত উপর দিকে তুল্‌ল, সূর্য তাড়াতাড়ি গিয়ে আকাশে দেখা দিল। হনুমানও গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে তার জায়গায় পর্বতকে রেখে দিয়ে এল।

তারপর বেঙ্গমীর ছানা, গন্ধমাদনের পেঁচার ছানাকে বল্‌ল, “বন্ধু, এখন আমি যাই। তুমি যখনি আমাকে মনে করবে, তখনি আসব। তুমি কিনা দিনের বেলা ভাল দেখতে পাও না, রাত্রে দেখতে পাও, তাই রাত্রে বেড়াতে, খাবার খুঁজে নিতে তোমার জন্য ব্যবস্থা। জগৎকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি, যার জন্য যা ভাল, তাকে সেই রকম ভাবে রেখেছেন। বুঝলে?”

মন্দ পরী

ভাল পরীর কাছে হেরে গিয়ে মন্দ পরী ঠিক করল, এমন জায়গায় এবার বাসা নেবে, যেখানে ভাল পরী নেই। সে এই রকম বাসা খুঁজে বেড়াতে লাগল। এক গ্রামে একটা মস্ত বড় বাড়ি দেখতে পেল মন্দ পরী। দোতলার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, এক বুড়ী তার তিন নাতিকে নিয়ে গল্প করছে, বড় মেজ আর সেজ নাতি। এমন সময়ে ছোট নাতি এসে জিজ্ঞাসা করল, “ঠাকুমা, বাতাসা রাখবে? গুড়ের বাতাসা?”

বুড়ীর ডান দিকে ছোট নাতি দাঁড়িয়ে ছিল। তার দাদারা বল্‌ল, “এই দিকে এসে বল্; ও কানে তো ঠাকুমা শুনতে পায় না।”

কাজেই ডান দিক দিয়ে গিয়ে ছোট নাতি আবার জিজ্ঞাসা করল, “বাতাসা রাখবে?”

ঠাকুমা হেসে বল্‌ল, “রাখব বই কি মণি। সরকারকে বল গিয়ে, একটা বড় হাঁড়ি ভরা বাতাসা রাখতে।”

মন্দ পরী ভাবল, “এইবার বাসা পেয়েছি। ও কান তো কালা, কেউ নেই ওখানে। আমি বাঁ কানে বাসা বাঁধি।”

তারপর থেকে ঠাকুমা যেন কেমন হয়ে গেল। বাজার সরকারকে ডেকে বল্‌ল সে, “বাজারে বড্ড বেশী টাকা খরচ হচ্ছে। চাল ডাল কমাও।”

"কি ক'রে কমাব? সকলেরি তো মাপা চাল ডাল বরাদ্দ।" উত্তর করল সরকার।

"ঐ মাপা থেকে এক মুঠো ক'রে কম কর। এত বেশী খরচ হলে আমি ফতুর হয়ে যাব।"

সরকার আর কি করবে? পরদিন সবাই এক মুঠো করে চাল কম পেল। তারা বল্‌ল, "এ কি হল? চাল কম কেন?"

সরকার একটু হেসে জবাব দিল, "ঠাকুরানীর হুকুম।"

"হুঁ।" বলে মাথা নাড়ল সবাই, যেন কিছু মতলব আছে মনে।

পরদিন থেকে সবাই কাজ কমিয়ে ফেল্‌ল। ঠাকুর ভাত তরকারি রেঁধে দিয়ে, থালায় থালায় বেড়ে, ঢেকে রেখে, ঘুমাতে যায়। কে খেল না খেল দেখে না। ঝি এঁটো বাসন ফেলে রাখে, রাত্রে মাজে না, সকালে উঠে মাজে। কুকুর বেড়াল রাতভোর উঠোনে বাসন টানাটানি করে, ছড়িয়েমড়িয়ে নোংরা করে। জমাদার ঝাঁটপাট দিয়ে উঠোনের দেয়ালের ওপাশেই জঞ্জাল ফেলে, বাইরে নিয়ে যায় না। জঞ্জাল জড়ো হয়ে সেখানটা আঁস্তাকুড় হল; মাছি ভন্‌ ভন্‌ করে, ঘরে ঢোকে।

বুড়ী ঠুক্‌ ঠুক্‌ ক'রে বেরিয়ে এসে, চারদিকে চেয়ে বলে, "আচ্ছা, দেখাচ্ছি।"

ঘরে বসে মতলব আঁটে, আর কি করতে পারা যায়।

শেষটায় খাজাঞ্চী কাজে ঢিলা দিল। হিসাবপত্রের গোলমাল হতে লাগল।

রেগে গিয়ে বুড়ী খাওয়া-দাওয়ার আরোই কড়াকড়ি আরম্ভ করল।

এবারে রাগ পড়ল গিয়ে নাতিদের উপর। ঠাকুমার ধরনধারণ দেখে, তারা আর আজকাল কাছে ঘেঁষে না।

বুড়ী কটমট করে ভাইঝিকে বলল, 'এইটুকু ভাত কি এনেছ? আর ভাত কোথায়?'

নাতিদের খাওয়া এবারে কম করা হল। তারা ছেলেমানুষ, আদরে লালিত, ক্রমেই তাদের শরীর হল দুর্বল আর রোগা।

বুড়ীর এক গুরুঠাকুর ছিলেন। লোকের মুখে এসব কাণ্ডের কথা শুনে তিনি দেখতে এলেন। এসে তো তাঁর চক্ষু স্থির!

তারপর বুড়ীকে গিয়ে শাসালেন, "বাবার কাছ থেকে টাকা পেয়েছ ব'লে বড় অহঙ্কার হয়েছে, না? তোমার ছেলেরা বেঁচে থাকলে এসব হতে পারত কি? তাদের ছেলেদের তুমি এমন ক'রে কষ্ট দিচ্ছ! ধর্ম এত অত্যাচার সইবেন না। এ আমি বলে দিলাম। নাতি চারটিকে আমার বাড়ি নিয়ে চল্লাম।"

বুড়ীর এক দূর সম্পর্কের ভাইঝি ছিল, সে বুড়ীর সেবা করত, তার খাবার এনে দিত উপরে। সেই রাত্রে ভাইঝি খাবার আনলে, বুড়ী কটমট ক'রে তার দিকে তাকিয়ে বল্ল, "এইটুকু ভাত কি এনেছ? আর তরকারি কোথায়? আমি কি এই দুটি খাব?" বলে, সে রেগে খাবারসুদ্ধ থালা ভাইঝির কপালে ছুঁড়ে মারল।

থালার কানায় কপাল কেটে গেল, ভাইঝি দৌড়ে পালাল, আর ওমুখো হল না।

পরদিন সকালে কেউ বুড়ীর খাবার নিয়ে এল না। খানিক অপেক্ষা ক'রে, সে রাগে গজগজ করতে করতে চল্ল নিচে রান্নাঘরে। সিঁড়িতে কলার খোসা, না কি, পড়ে ছিল, তাইতে পা পিছলিয়ে, গড়াতে গড়াতে বুড়ী একবারে সিঁড়ির নিচে পড়ে গেল। পড়েই অজ্ঞান।

ভাইঝি রান্নাঘরে ব'সে কাঁদছিল, সে তাড়াতাড়ি ছুটে এল। লোকজনরাও এল। হাজার হোক, বুড়ো মানুষ, সকলেই এতদিন তার নুন খেয়েছে। সবাই মিলে ধরাধরি করে তাকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। খবর পেয়ে কবিরাজ এলেন।

গুরুঠাকুরও এলেন খবর পেয়ে। তখন বুড়ীর জ্ঞান হয়েছে; গুরুঠাকুরকে দেখেই কেঁদে উঠল।

"আমি অনেক অন্যায় করেছি ঠাকুর, আমায় ক্ষমা করুন। এই কান মলছি।" ব'লে সে এত জোরে কান মুড়তে লাগল যে মন্দ পরী ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়ে পালাল সেখান থেকে।

"আমার নাতিদের এনে দিন। তাদের না দেখে আমি থাকতে পারছি না।" বল্ল বুড়ী।

নাতিরা কাছেই ছিল। বড় মেজ সেজ ছোট নাতি ছুটে এসে চারদিক থেকে ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরল।

রাজার দূত

টোকন জানালার ধারে বসে দেখছিল, সূর্য অস্ত যাচ্ছে ; তাকে ঘিরে ঢিপি ঢিপি লাল মেঘ, যেন আকাশের গাছ। সেই গাছে ফুটেছে রাশি রাশি ঝকুঝকে সোনার ফুল। মনে মনে সে ভাবছিল, "কি সুন্দর দেশ! ওখানে কি যাওয়া যায় ?"

কে যেন বল্‌ল, "যাবে ওখানে ? চল।"

চমকে উঠে টোকন জিজ্ঞাসা করল, "কে তুমি ? কোথা থেকে কথা বলছ ?"

"আমি কল্পনা-পাখি। তোমার মনের মধ্যে আছি। তোমার মনের ঘরে কত কী আছে,—বিবেক আছে, যে তোমাকে বলে দেয়, কোন্‌টা করা উচিত, কোন্‌টা করা অন্যায় ; ভালবাসা আছে, দয়ামায়া আছে। রাগও আছে কিন্তু। এদের সঙ্গে, এক কোণে আমিও বসে আছি।"

"তুমি কি কর ?"

"যেখানে তুমি নিজে যেতে পার না, কিন্তু যেতে চাও সেইখানে আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি। ঐ আকাশ-পারে যাবে ?"

"যাব।"

"তবে আমার পিঠে বসো, আমি উড়ে চলে যাব। যখন সময় হবে, আমরা আবার নেমে আসব নিচে।"

সেই মেঘের দেশে, মেঘের গাছে সোনার ফুল ফুটেছে। কত ঝ'রে পড়েছে তলায়। মেঘের মেয়েরা ফুল নিয়ে মালা গাঁথছে, টোকন দেখল।

সে জিজ্ঞাসা করল, "ফুলের মালা কেন গাঁথছ ?"

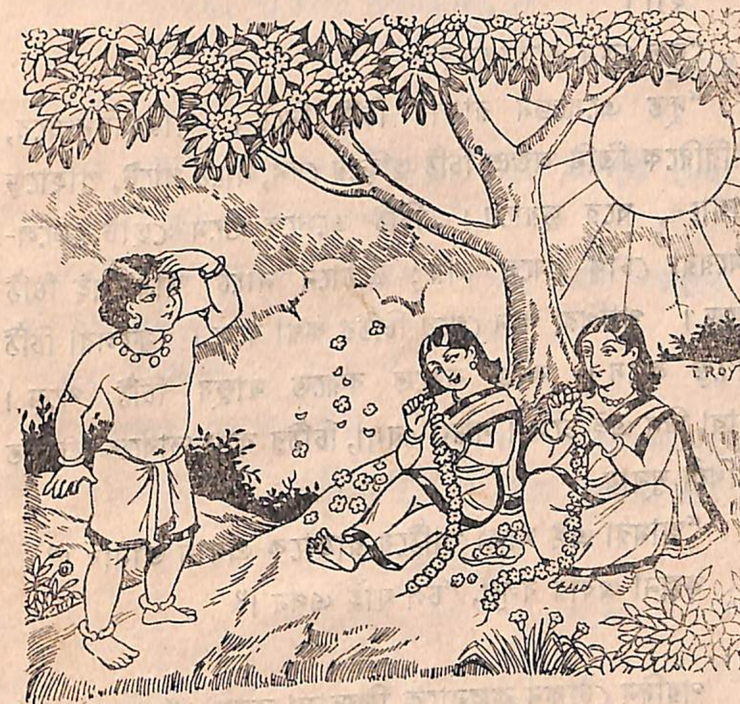

মেঘের দেশে টোকন

মেয়েরা উত্তর দিল, "রাজার জন্য গাঁথছি, রাজাকে মালা পাঠাব।"

"কোথায় তিনি ? কেমন ক'রে পাঠাবে ?"

মেয়েরা বল্‌ল, "পিছনে চেয়ে দেখ। রাজার দূত অপেক্ষা করছেন ; তাঁর হাতে পাঠাব।"

পিছন ফিরে টোকন দেখতে পেল, সোনাঢালা পথ এক, চলে গেছে অনেক দূর। সেই পথের শেষে, কার গোল মুখখানা; এত উজ্জ্বল যে, চাওয়া যায় না মুখের দিকে।

"ঐ কি রাজার দূত?"

"হ্যাঁ।"

"দূত কেন এসেছেন?"

"দূত এসেছেন রাজার চিঠি নিয়ে। সারা দিন ধরে, চারিদিকে তিনি অজস্র চিঠি ছড়িয়ে দেন, মাঠে ঘাটে, পাহাড়ে বাগানে, ঘরে দুয়ারে। চিঠি এসেছে শুনে ছোট ছেলে-মেয়েরা চোখ মেলে চায়; উঠোনে নাচে আর সেই চিঠি পড়ে। পাখিরা গান গেয়ে চিঠির কথা বলে। ফুলেরা চিঠি প'ড়ে হাসে। কাজ করতে করতে মানুষ চিঠি পড়ে। সারা দিন এই চলে। সন্ধ্যা বেলা, চিঠির কথা ভাবতে ভাবতে পৃথিবী ঘুমায়।

"আমরা এই মালা পাঠিয়ে রাজাকে প্রণাম জানাব।"

কল্পনা এবার বল্‌ল, "চল যাই এখন।"

পরদিন টোকন কল্পনাকে জিজ্ঞাসা করল, "রাজার চিঠি কি শুধু দিনের বেলা আসে? রাত্রে আসে না?"

"আসে বই কি। তবে রাত্রের চিঠি সকলে পড়ে না; ঘুমায় কিনা, তাই। তুমি পড়বে? আচ্ছা, আজ রাত্রে নিয়ে যাব রাজার দূতদের কাছে।"

রাত্রের আকাশে টোকনকে নিয়ে কল্পনা উড়ে চলেছে। পৃথিবী ছাড়িয়ে, সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ ছাড়িয়ে দুজনে পৌঁছাল

গিয়ে ছায়াপথের দেশে। সেখানে তারায় তারায় আবার ছেলেমেয়েরা নেচে নেচে খেলছে। সেখানে চাঁদের আলোর মত দুধ-নদী বইছে।

অসংখ্য তারা জ্বলছে মালার মত হয়ে।

টোকন বলছে, "এতজন রাজার দূত?"

আবার ছেলেমেয়েরা উত্তর দিল, "শুধু কি এরা? দূরে চেয়ে দেখ তো।"

"তাই তো! দূরে ওরা কারা? ওই অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ঘুরছে, ছুটছে, ছিটকে পড়ছে?"

"সবাই দূত, সবাই। বিশ্বের যিনি রাজা, তিনি বিশ্বজুড়ে চিঠি পাঠাচ্ছেন।"

"ওখানে যাব?"

"অত দূরে যাবার আমার শক্তি নেই।" বল্‌ল কল্পনা, "এবারে পৃথিবীতে চল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, স্বপ্নে রাজার চিঠি পড়।"

———

ছোটদের মনের মত কটি বই

সুখলতা রাও'র

সোনার ময়ূর	২·৫০	বনে ভাই কত মজাই	২·৫০
গল্প আর গল্প	৪·৫০	নানান দেশের রূপকথা	৩·০০
কিশোর গ্রন্থাবলী	৪·৫০	দুই ভাই	২·৫০

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর

গ্রন্থাবলী ১০৲

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের

ঠাকুমার ঝুলি	৪·৫০	ঠাকুরদাদার ঝুলি	৪·৫০
কিশোর গ্রন্থাবলী	৪·৫০	দাদামশায়ের থলে	৪·৫০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

পৃথিবীর ইতিহাস	৪·০০	কিশোর গ্রন্থাবলী	৪·৫০
কাউণ্ট অফ মণ্টেক্রীস্টো	২·০০	বিদেশী গল্প সঞ্চয়ন ১ম	৩৲ ২য় ৩৲
গান্ধী জীবনী	১·৫০	এ টেল অফ টুসিটিজ	২·০০

সুমথনাথ ঘোষের

কিশোর গ্রন্থাবলী	৪·৫০	ছোটদের বিশ্বসাহিত্য	২·০০
ডেভিড কপারফিল্ড	২·০০	সুইস ফ্যামিলী রবিনসন	১·০০

মৌমাছির

মায়ের বাঁশী	৪·৫০	রূপকথার ঝুলি	৪·০০

লীলা মজুমদারের নূতন বই

নেপোর বই ৩·৫০

গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষ সম্পাদিত

ঐতিহাসিক গল্প সঞ্চয়ন ৩·৫০